'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা, মার্চ, ২০২০

বর্ণপরিচয়

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 118 Volume

March, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Dr.Narendranath Roy

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

SCAN AnyScanner

২৯.এবং আস্তিক বিদ্যাসাগর
:: তরুণ মুখোপাধ্যায়.....২১৮
৩০.বিদ্যাসাগর ও নারী শিক্ষার পদক্ষেপ
:: কাঞ্চন হেমব্রম.....২২৪
৩১.বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন?
:: ড. সৌগত চট্টোপাধ্যায়.....২২৯
৩২.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা এবং
বর্তমান সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা
:: ড. হজরত আলি শেখ.....২৩৮
৩৩.বিদ্যাসাগরের আখ্যানমঞ্জরী : জীবনে অনুভবে
:: ড. উজ্জ্বল শীল.....২৪৩
৩৪.তেজোময়, অদম্য অথচ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
:: ড. সাবলু বর্মণ.....২৫০
৩৫.দ্বিশততম জন্মদিবসের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগরের চিন্তাচেতনা ও
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান
:: ড. ঈপ্সিতা হালদার.....২৫৬
৩৬.শিশু শিক্ষায় বিদ্যাসাগর
:: ড. অমিতাভ দত্ত.....২৬৫
৩৭.বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক সংস্করণ
:: ড. শুভশ্রী রায় চৌধুরী.....২৭০
৩৮.বিদ্যাসাগরের একটি সামাজিক সংস্কার : বিধবাবিবাহ
:: ড. সমীর প্রসাদ.....২৭৮
৩৯.সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ ভাবানুবাদ : 'ভ্রান্তিবিলাস'
:: ড. দেবাশিস সরদার.....২৮৬
৪০.বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও নারীমুক্তি ভাবনার অচর্চিত ইতিহাস
:: ড. সুপম বিশ্বাস.....২৯২
৪১.বিদ্যাসাগর ও স্ত্রীশিক্ষা
:: ড. মৌসুমী চক্রবর্তী.....২৯৭
৪২.বাংলা গদ্য ও বিদ্যাসাগর : চর্যা থেকে জলসা
:: ড. স্বর্ণকমল গোস্বামী.....৩০০

দ্বিশততম জন্মদিবসের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগরের চিন্তাচেতনা ও ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান

ড.ঈপ্সিতা হালদার

ভূমিকা :

রাজা রামমোহন রায় বাংলায় নবজাগরণের স্রষ্টা হলেও সেই নবজাগরণের আলোকে আরো বেশি উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের অতি পরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিদ্যাসাগর একাধারে লেখক, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী এবং মানবতাবাদী। তিনি তৎকালীন সময়ে বাঙালির জনজীবনে শিক্ষা বিস্তারের এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল অক্ষর পরিচয় করবার জন্য তাঁর লিখিত বই বর্ণপরিচয়। বাঙালির ঘরে ঘরে এই পুস্তক আজও সমানভাবে সমাদৃত। শিশুকালে বর্ণপরিচয় পড়েননি এমন বাঙালি খুব কমই আছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডারের জন্য বাঙালি সমাজ তাঁকে বিদ্যাসাগর বা জ্ঞানের সাগর উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন– *"The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother."*।

বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবন ও শিক্ষালাভ :

১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী দুজনেই ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তবুও বিদ্যাসাগর তাঁর অসাধারণ মেধার জোরে সমস্ত প্রকার প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশুকালে গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর অক্ষর পরিচয় হয় ও তিনি বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ে প্রাথমিকভাবে শিক্ষালাভ করেন। এরপর ১৮২৬ সালে তিনি পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আরো ভালোভাবে শিক্ষালাভ করার জন্য কোলকাতা যাত্রা করেন। পিতার সঙ্গে কোলকাতা যাত্রাপথে তাঁকে নিয়ে একটি বহুল প্রচলিত গল্প আমরা দুটো থেকেই শুনেছি। যাত্রাপথে মাইলসে ানে লেখা ইংরেজি নম্বর দেখে তিনি প্রথম ইংরেজি *Numerals* শিখে গিয়েছিলেন এবং পিতার

কাছে তার প্রমাণও দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। কোলকাতার বড়বাড়ীর অঞ্চলে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি দিনের বেলা বিদ্যালয়ের সময় বাদ দিয়ে অন্য সময় পিতাকে নানা সাংসারিক কাজে ও রান্নার কাজেও সাহায্য করতেন। রাতে রাস্তার গ্যাসের আলোর নীচে বসে তিনি পড়াশুনা করতেন, বাড়িতে তা করলে তেল খরচা হবে এই কথা অনুধাবন করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বেঁচে যাওয়া তেল দিয়ে পরের দিন রান্নার কাজ হবে বলে তিনি রাস্তার গ্যাসের আলোর নীচে বসেই নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যান। যদি ঘুম এসে যায় তাই তিনি তাঁর মাথার বড় চুল লাইটপোস্টের সাথে বেঁধে রাখতেন। ঘুমে ঢুলুনি এলে টিকির চুলে টান পড়বে ও ঘুম চলে যাবে একথা ভেবে। তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজে অন্য অনেক ব্রাহ্মণের মতই তিনিও মাথায় টিকি রাখতেন যার যাহায্যে তিনি নিজেকে জাগ্রত রাখার অদ্ভুত উপায় তৈরি করেছিলেন। তিনি তাঁর অসাধারণ মেধার সাহায্যে নানাবিধ পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি বেদ-বেদান্ত, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করার দরুণ তিনি জলপানি বা *scholarship* পান। পারিবারিক অবস্থা ভালো করবার উদ্দেশ্যে তিনি জোড়াসাঁকোর একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এই সময়ে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে দীনমণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, নাম রাখেন নারায়ণচন্দ্র।

কর্মজীবন :

১৮৪১ সালেই মাত্র একুশ বছর বয়েস ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হিসাবে তিনি যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইংরেজি ও হিন্দি ভাষাতেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৪৬ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ত্যাগ করেন এবং সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই কিছু প্রশাসনিক মতপার্থক্য দেখা দেওয়ার ফলে তিনি সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ তেজস্বী ও আত্মসচেতন ব্যক্তি, ক্ষমতালোভী ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। পরবর্তীকালে আবার তিনি সংস্কৃত কলেজে ফিরে আসেন নিজের কিছু শর্ত নিয়ে। তিনি সংস্কৃত কলেজের কিছু প্রশাসনিক রদবদল চেয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ তা মেনে নেওয়ায় তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন অধ্যাপক পদে। ১৮৫১ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এর সাথে ১৮৫৫ সালে তাঁকে *Special Inspecter of Schools* পদের দায়দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি তা গ্রহণ করে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি পরিদর্শনের কাজ শুরু করেন যাতে সেখানেও উপযুক্ত শিক্ষার

বিস্তার ঘটানো যায়।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংশোধন সংক্রান্ত নানা কার্যাবলী :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি। এব্যাপারে তিনি প্রথম পরিবর্তন ঘটান সংস্কৃত কলেজে। অধ্যাপক পদে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেবার পরেই তিনি সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলা ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও সংস্কৃতের পাশাপাশি এই দুই ভাষায় জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। বেদের পাশাপাশি তিনি ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানচর্চার কথাও বলেন। এই বিষয়গুলি সম্পর্কেও ছাত্রদের জানার প্রয়োজন আছে। তৎকালীন সময়ে সংস্কৃত কলেজে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারতো। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই পুরোনো নিয়মের পরিবর্তন করে অব্রাহ্মণ মেধাবী ছাত্রদের কেও সংস্কৃত কলেজে ভর্তির সুযোগ করে দেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা সবার জন্য। তাই যে কোনো মেধাবী ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারবে বলে তিনি নতুন নিয়ম চালু করেন। তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'। কঠিন সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজসাধ্য বাংলা ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে এই দুই গ্রন্থে। তিনিই প্রথম কোলকাতায় ভর্তির খরচা এবং শিক্ষাদানের খরচা সাধারণ ছাত্রদের থেকে নেবার পরামর্শ দেন কলেজ কর্তৃপক্ষকে। যদিও তিনি বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশুনা করার ব্যবস্থাও করে দেন। তিনিই প্রথম শিক্ষক শিক্ষণের জন্য *Normal School* স্থাপন করেন যাতে শিক্ষকরা তাদের পড়ানোর পদ্ধতি আরো উন্নত মানের করতে পারেন। তিনি ছাত্রদের সরকারী চাকরী পাবার জন্য যাতে সাহায্য করা যায় সে ব্যাপারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্য চান। তিনি নারীদের শিক্ষা গ্রহণের উপরেও জোর দেন। নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করতেন, সমাজে নারীদের ওপর তৎকালীন হময়ে যে নানা অত্যাচার হত ঘরে বা বাইরে তা বন্ধ করা সম্ভব একমাত্র নারীশিক্ষার প্রসারের দ্বারা। নারীরা যদি শিক্ষিতা হয়ে উঠতে পারে তাহলে তারা যেকোনো সামাজিক অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেরাই রুখে দাঁড়াতে সফল হবে। তিনি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যাতে করে তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়। শুধু তাই নয় তারা যাতে শিক্ষিত হবার পাশাপাশি অন্যান্য কাজ যেমন সূঁচশিল্প প্রভৃতি হাতের কাজ শিখতে পারে সেই ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য নানান পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি, যার জন্য তিনি আজও প্রণম্য। তিনি কোলকাতার বিভিন্ন বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে পরিবারের প্রধান বা কর্তা যিনি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে এই বাড়ির মেয়েটি যাতে বিদ্যালয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষিতা হয়ে উঠতে পারে। বাড়ির থেকে

মেয়েদের পাঠালে তবেই তো বিদ্যালয় তারা যেতে পারবে। তাই বাড়ির মানুষদের বোঝাবার দায়িত্ব নিজেই তিনি পালন করেছিলেন। তিনি সারা বাংলায় ৩৫টি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খুলতে সফল হয়েছিলেন সেই সময়ে। এছাড়া ১৩০০ ছাত্রী তাঁর স্থাপিত এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ করতো। তিনি নারী শিক্ষা ভাণ্ডার গড়ে তোলবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রথম। পরবর্তীকালে তিনি নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য পাশে পান ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন নামে এক ইংরেজ শিক্ষাব্রতীকে যিনি ১৮৪৯ সালের ৭ মে মেয়েদের জন্য প্রথম বেথুন স্কুল স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর এই স্কুল স্থাপনে বেথুন সাহেবকে সবরকম ভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই বেথুন স্কুলই ভারতের প্রথম বিদ্যালয় যেখানে কেবলমাত্র মেয়েদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি সংবাদপত্রেও নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ', '*Hindu Patriot*' প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি নিজে নানা পরামর্শও দিতেন এব্যাপে। তিনি নিজে বহু পুস্তকও লেখেন যেখানে বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। তিনিই প্রথম 'বর্ণপরিচয়' নামে পুস্তকে ১২টি *Vowels* এবং চল্লিশটি *Consonants*-এ বাংলা অক্ষরকে পরিচিতি দেন। তিনিই প্রথম 'সংস্কৃত প্রেস' স্থাপন করেন, যাতে এই প্রেসের মাধ্যমে উপযুক্ত সাধারণ মূল্যে পুস্তক ছাপা হতে পারে এবং সাধারণ মানুষ তা কমমূল্যে কিনতে পারে। তিনি বাংলার ঘরে ঘরে তার লেখা পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার আলোকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

সমাজসংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর :

তৎকালীন সমাজে মহিলাদের ওপর নানা প্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ে জোরের সঙ্গে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা ভগবতী দেবী একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন যিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন সহায়সম্বলহীন মহিলা ও বিধবাদের জন্য কিছু করতে, যাতে তাদের দুঃখ যন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব করা যায়। এই বিধবা মহিলারা অবর্ণনীয় দুঃখকর্মের মধ্যে দিন কাটাতেন। তাদের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না, তারা কার্যতঃ একঘরে অবস্থায় একবেলা সেদ্ধ ভাত খেয়ে, বোঝার মত পরিবারের এককোণে কোনোমতে বেঁচে থাকতো। কখনো কখনো তাদের কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বিদ্যাসাগর শপথ নিয়েছিলেন যে, তিনি এইসমস্ত সহায়সম্বলহীন মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্য সারাজীবন লড়াই করবেন। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজ একারণে তাঁকে নানাভাবে বাধা দেয়, লাঞ্ছিত করারও চেষ্টা করে। তবুও তিনি মনের জোরে নিজের কাজে এগিয়ে চলেন।

তিনি তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে দেন বিধবা বিবাহের কথা বেদে আছে কাজেই তা ধর্মবিরোধী কাজ নয়। তিনি বেদ এর উদাহরণ দ্বারা বিধবা বিবাহ অন্যায় নয়, একথা প্রমাণ করে ইংরেজ শাসকবৃন্দের কাছে

SCAN AnyScanner

আবেদন করেন। এব্যাপারে আইন পাশ করবার জন্য। মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৬ সালের (*Act XV*) ২৬ শে জুলাই হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। বিদ্যাসাগর এখানেই থেমে যাননি। তিনি নিজে যোগাযোগ করে বহু বিধবা মেয়ের আবার বিবাহ দেন নিজের খরচে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। এমনকি ১৮৭০ সালে নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গেও একটি বিধবা কন্যার বিবাহ দেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও পরার্থপরতা :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুহৃদয় সম্পন্ন তেজস্বী মানুষ। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল মায়ামমতাপূর্ণ কোমল। এককথায় বলা যায় তাঁর মধ্যে কঠোর ও কোমল দুই বিপরীত চরিত্রের সমন্বয় ঘটেছিল। নিজের কাজের প্রতি তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যা বলতেন তাই করতেন। সেই দিক থেকে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ও কঠোর। আবার এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরের দুঃখে হয়ে উঠতেন কোমল, নরম হৃদয় সম্পন্ন একজন মানুষ। অসাধারণ সাহসী মনের পরিচয় দিয়ে তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাশ করান। তিনি কোনো রকম অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না, সেটা কোনো ভারতীয় কর্তৃক করা অন্যায় হোক বা কোনো ইংরেজ কৃত অন্যায়; যাইহোক, সবধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঠিক জবাব দিতেন তিনি। এই নিয়ে নানা গল্পও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। গরীবের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি নিজের মাস-মাহিনার অধিকাংশ টাকা ব্যয় করে ফেলতেন। মেধাবী দরিদ্র ছাত্র, সহায়সম্বলহীন বিধবা, অত্যাচারিত স্ত্রীলোক কেউ তাঁর দয়া পাওয়া থেকে বাদ যেত না। এমনকি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে যান পড়ার জন্য এবং তারপর ইংল্যান্ডে অপরিসীম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন বিদ্যাসাগরকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে পত্র লেখেন, বিদ্যাসাগর তখন মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারেননি। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আর্থিক সাহায্য পাঠান ও কবিতা লিখতে তাঁকে আরো অনুপ্রাণিত করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতাগুলিকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলে বিদ্যাসাগর মনে করতেন এবং তিনি সাহায্য পাঠাবার সাথে সাথে মাইকেলকে আরো নতুন নতুন কবিতা লিখতে সাহস জোগাতেন। পরবর্তীকালে বারবারই তিনি মধুসূদনকে আর্থিক সাহায্য জুগিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে 'দয়ার সাগর' নামে ভূষিত করেন। সত্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের ভবিষ্যতের কথা, পরিবারের উন্নতির কথা কখনোও ভাবেননি। সারাজীবন তিনি অন্যের দুঃখে নিজে চোখের জল ফেলেছেন, অন্যের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করেছেন। সমাজের উন্নতির জন্য এই মহান হৃদয় ব্যক্তিত্ব নিজের সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মহানুভবতা ও দয়ার নানা গল্প আজও বাঙালি সমাজে প্রচলিত এবং একটি গল্পের অবতারণা এই প্রসঙ্গে করছি। একবার বিদ্যাসাগর একটি গ্রামে স্কুল পরিদর্শনের কাজে গিয়েছিলেন। গ্রামের পথে

যেতে যেতে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ পেয়ে একটি জীর্ণ কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ভিতরে গিয়ে জানতে পারে একটি গরীব পরিবার সেই কুটিরে বাস করে এবং পরিবারের কর্তা মারা গিয়েছেন কিছুপূর্বে। কিন্তু তার শবদেহ দাহ করার মতোও আর্থিক অবস্থা পরিবারের সদস্যদের নেই। তার ওপর আবার পাওনাদারেরা দশ টাকা নেবে বলে সেখানে উপস্থিত। এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই বাড়ির সদস্যদের বলেন যে পরিবারের কর্তা একসময় বিদ্যাসাগরকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, তাই আজ তিনি সেই টাকা শোধ করবার জন্যই এই বাড়িতে এসেছিলেন। যার কাছে টাকা শোধ করতে এসেছিলেন সে তো আর বেঁচে নেই। তাই তার পরিবারের হাতেই আজ তিনি এই টাকা দিয়ে যাবেন, পরিবারের সদস্যরা যেন বিদ্যাসাগরেক ঋণমুক্ত করেন। এই কথা বলে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে করতে তিনি টাকা তুলে দেন পরিবারের সদস্যদের হাতে। পরে বাড়ি থেকে ফেরার সময়ে তাঁর সঙ্গীরা ঈশ্বরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে সত্যই কি তিনি ঐ পরিবারের কর্তার কাছ থেকে কোনদিন টাকা ধার করেছিলেন? উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন— 'না'। তিনি সত্য কথা বললে ঐ পরিবার তাঁর দেওয়া টাকা কখনোই নিত না। তাই এই মিথ্যার অবতারণা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গীরা তাঁর মহান হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যায়। এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কখনোও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতেন না। একবার শিক্ষাসংক্রান্ত কিছু কারণে এক ইংরেজ আধিকারিকের সাথে তিনি দেখা করতে যান। বিদ্যাসাগরকে দেখেই সাহেব আধিকারিক মহাশয় নিজের বুটজুতো পরিহিত পদযুগল টেবিলের ওপরে তুলে দেন ও সেই অবস্থাতেই পা নাড়াতে নাড়াতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন। কথা শেষ হলে বিদ্যাসাগর চলে যান। এই ঘটনার কিছুদিন পর ঐ ইংরেজ সাহেব আধিকারিক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলে সাহেবকে দেখামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর খড়ম পরিহিত পদযুগর টেবিলে তুলে দেন ও সেই অবস্থাতেই পা নাড়াতে নাড়াতে সাহেবের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। সাহেব তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন— 'আপনার কি সভ্যতা ভদ্রতাবোধ একেবারেই নেই। এইভাবে পা তুলে কেন কথা বলছেন?' বিদ্যাসাগর তখন উত্তর দেন— 'সাহেব এতকাল ধরে তো শুনেছি আপনারা ইংরেজরা নাকি অতি সুসভ্য জাতি। তাই আপনি যখন সেদিন আমাকে দেখে আপনার অফিসে পদযুগল টেবিলে নাড়াতে থাকলেন আমি ভাবলাম এটা বুঝি ভদ্রতা ও সভ্যতার পরিচয়। তাই আজ আমিও সেইভাবেই আপনাকে অভ্যর্থনা করলাম। আমরা তো আপনাদের দেখেই ভদ্রতা-সভ্যতা শিখছি কিনা?' এরপর ইংরেজ আধিকারিক সাহেব নিজের ভুল বুঝতে পারেন ও বিদ্যাসাগরের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন ও লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। এই ঘটনা থেকে বিদ্যাসাগরের আত্মসচেতন বোধ, আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয়রাও মানুষ এবং তাদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর তা প্রমাণ

SCAN AnyScanner

করেন।

বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী নিজেও খুব বিশাল মানসিকতাসম্পন্ন দয়াবতী মহিলা ছিলেন। মাতার দেওয়া শিক্ষা বিদ্যাসাগরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। একবার তাঁর মতো পুত্রকে পত্র লেখেন তিনি শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। পুত্র ঈশ্বর যেন গ্রামের বাড়িতে আসার সময় তাঁর জন্য চাদর নিয়ে আসে। ঈশ্বরচন্দ্র মাতার জন্য চাদর কিনে নিয়ে গেলেও ভগবতী দেবী সেই চাদর তীব্র শীতেও গায়ে দিলেন না। তা দেখে বিদ্যাসাগর মাতার কাছে জানতে চান কেন তিনি চাদরটি শীতে ব্যবহার করছেন না? তখন ভগবতী দেবী উত্তর দেন গ্রামের অধিকাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুদেরও অনেকেরই শীতে ব্যবহারের গরম চাদর নেই। তিনি সবার মা, তাই তিনি কি করে একা চাদর ব্যবহার করবেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতার কথা বুঝতে পারেন ও সকলকে দেবার জন্য পুনরায় অনেকগুলি গরম চাদর ক্রয় করে নিয়ে আসেন। দয়াবান দানের সাগর বিদ্যাসাগর মাতা ভগবতী দেবীর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন তাই তাঁর মধ্যেও দয়া, মায়া, মমতা, নিজের কথা না ভেবে অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি মহৎ গুণগুলির ক্রমন্বয় ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অপরদিকে আবার কোমল-নরম, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী পরের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া দয়ার সাগর।

ঈশ্বরচন্দ্রের শেষ জীবন :

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বাংলার নবজাগরণের অন্যতম স্তম্ভ, শিক্ষাসংস্কারক, সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই পরলোকগমন করেন মাত্র সত্তর বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন— *'One wonders how God, in the process of producing forty million Bengalis, produced a man!'*

বর্তমান আধুনিক যুগে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা :

বাঙালির নমস্য বিদ্যাসাগর গত হয়েছেন বহু আগেই। তবুও বাঙালির জীবনে বর্তমানেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আজও যেকোনো বাঙালি পরিবারের শিশুর বাংলা অক্ষরের পরিচয় হয় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বর্ণপরিচয়' পুস্তকটির মধ্য দিয়ে। এত সহজে প্রাণবন্তভাবে পুস্তকটিতে শিশুদের জন্য অক্ষর পরিচয় করিয়েছেন তিনি যা অনবদ্য।

আজও প্রত্যেক বাঙালি তথা ভারতীয় পরিবারে তাঁকে স্মরণ করা হয় একজন মেধাবী ছাত্র, সুপণ্ডিত, বহু পুস্তক লেখক, ব্যাকরণবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষাসংস্কারক, শিল্প প্রসারক তথা সমাজ সংস্কারক হিসাবে। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও যে নিজগুণে, নিরলসভাবে বৃত্তি পেয়ে পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, বিদ্যাসাগর তার

উদাহরণ। তাঁর জীবনের এই গল্প প্রত্যেক শিশুর চলার পথের প্রেরণা, যে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি বিষয়েও অধ্যয়ন করে জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলেন। তিনি আইনের ডিগ্রীও অর্জন করে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যা হয়তো অনেকেই জানেন না। তাঁর জীবনকাহিনিতে যেকোনো দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীর কাছে আজও অনুপ্রেরণা জোগায়।

আজকের বর্তমান ভারতীয় সমাজে এখনো জাত-পাত, ধর্ম-কর্ম নিয়ে নানা সমস্যা অব্যাহত। এখনো উঁচু জাতি-নীচু জাতির বৈষম্য ভারতের রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে অব্যাহত। বিদ্যাসাগর আজ থেকে বহুযুগ আগে জন্মেও শিক্ষার ক্ষেত্রে জাত, বর্ণের বাঁধন মানেননি। তৎকালীন যুগে সংস্কৃত কলেজে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানদের পড়াশুনা করবার নিয়ম চালু ছিল। বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বহুযুগ ধরে চলা নিয়ম ভেঙে দেন। তিনি ব্রাহ্মণ আন্দোলন ছাড়াও যেকোনো মেধাবী ছাত্রের জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। নীচ জাতি, উঁচু জাতির পার্থক্য তাঁর কাছে ছিল না। মেধাবী যে কোনো ছাত্রের পড়াশুনা চালাবার ব্যবস্থা করে দিতেন তিনি। যা আজকের দিনেও অনুকরণযোগ্য। তাঁর আদর্শ আজও আমাদের পথ দেখায়। তিনি মনে করতেন সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার সকলের আছে। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানরা সংস্কৃত অধ্যয়ন করতে পারবে এটা ঠিক নয়। এই বিচারবোধের জন্য তিনি আজও নমস্য।

পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি তিনি হাতে কলমে শিক্ষার ওপরেও জোর দেন। তিনিই প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি কালিদাসের লেখা 'শকুন্তলা' বইটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও বহু সংস্কৃত বই এর বাংলা অনুবাদ তিনি করেছিলেন, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তিনি গোঁড়া হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মের নামে অন্যায় ব্যবস্থাকে বন্ধ করবার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন নারী জাতির পথ প্রদর্শক। তৎকালীন সমাজে বিধবা মহিলাদের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার করা হত। তাদের ওপর নানা ধর্মীয় বাধানিষেধ ছিল, একবেলা খেয়ে থাকা এই আধমরা বিধবাদের জন্য তিনি বেদ-উপনিষদ পড়ে নতুন আইন চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন চালু করেন ইংরেজ সরকার। তিনি নিজের পুত্রের সাথেও বিধবাবিবাহ দেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বলা যায় বাংলার নারীজাতির উন্নতি হয়েছিল তাঁরই হাত ধরে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনিই প্রথম বিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই মেয়েদের এগিয়ে আসা সম্ভব তা একমাত্র তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন তৎকালীন সমাজে। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রদ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন নারীজাতিকে সুনিশ্চিত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা আজও অনুকরণীয়। কারণ বর্তমান সুশিক্ষিত সমাজেও আজকের

বর্তমান যুগেও আমরা বিধবা বিবাহ খুব কমই দেখতে পাই। এখনোও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিধবারা ব্রাত্য। কয়েক বছর আগেও রাজস্থানের এক গ্রামে সতীদাহের মত ঘটনা ঘটেছে। তাই আজও বিদ্যাসাগরের দেখানো পথ ধরে নারী শিক্ষা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজের অর্ধেক আকাশ হল নারী। তাদের অশিক্ষিত করে রাখলে ভবিষ্যত প্রজন্মও অশিক্ষিত থেকে যাবে। তাই আজও নারীশিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদ্যাসাগরের অনুকরণ, অনুসরণ আজকের যুগেও তাই আমাদের প্রয়োজন। কারণ নারীদের ওপর অত্যাচার আজও মাঝে মাঝেই দেখা যায়। শিক্ষার বিস্তার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার বিস্তার যত হবে ততই এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র আইন দ্বারা নয়, শিক্ষার বিস্তার দ্বারাও নারীর উন্নতি সম্ভব এই পথ বিদ্যাসাগরই প্রথম দেখিয়েছিলেন, যা আমরা আজও অনুসরণ করে চলেছি। তিনি শিশুবিবাহ বা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও মতামত দিয়েছিলেন, যা আজও সমানভাবেই অনুকরণীয়। বিদ্যাসাগর নিজের জীবনের শেষ ১৮ বছর বর্তমান ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল ট্রাইবালদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেখানে তিনিই প্রথম সাঁওতাল মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও শিশুশিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন।

উপসংহার :

সারাজীবন ধরে তিনি বাংলার তথা ভারতীয় নারীদের শিক্ষার জন্য, তাদের উন্নতির জন্য লড়াই করেছেন। তিনি মনে করতেন নারীকে তার অধিকার লড়াই করেই পেতে হবে আর এর জন্যই প্রয়োজন নারীশিক্ষার। শিক্ষার আলো পেলে তবেই নারীদের জীবনে উন্নতি সম্ভব। এই কারণে তাঁর নামে নানা প্রবচনও শোনা যায়— "বেঁচে থাক্ বিদ্যাসার্গর চিরজীবী হয়ে, বিধবাদের দিল বিয়ে ইত্যাদি।" আজ থেকে বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি মানসিক দিক থেকে ছিলেন একজন প্রকৃত আধুনিক মানুষ। তাঁর ২০০ তম জন্মদিবসের প্রাক্কালে আজও তিনি আমাদের কাছে পথপ্রদর্শক, নমস্য, প্রণম্য।